ফল চাষেই বড়লোক

ঝিনাইদহের আজিজুর রহমানের মতো আপনিও উদ্যোগী হতে পারেন

আজিজুর রহমান ফলচাষী। কলা চাষ করে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়েছেন। এখন ডালিম, লিচু, সুপারীর চাষ করছেন। এবং এই বাগানের মাঝে অন্য চাষ করছেন। যা থেকে তার প্রজেক্টের খরচ উঠে আসবে। লিচু, ডালিম চাষ করেই আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এলাকার অন্যতম ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হবেন। শুধু ফলের চাষে তার গাড়ি-বাড়ি সব হয়েছে....লিখেছেন **সাইফুল হাসান**

এলাকার সবাই তাকে এক নামে চেনে। তিনি কোনো রাজনৈতিক নেতা নন, সমাজসেবক নন কিংবা সন্ত্রাসীও নন। ছোট-বড় সবাই তাকে ভালোবাসে। সম্মান করে। যে লোকটিকে নিয়ে কথা হচ্ছে তিনি একজন সাধারণ কৃষক। তার ভাষায় চাষা। এই চাষা লোকটি শুধু চাষ করে এলাকায় বিখ্যাত। অনেক মানুষের মডেল।

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানার চাঁদপুর বাসস্ট্যান্ড। তার নাম বলতেই একজন ভ্যানচালক ভ্যানে উঠে বসতে বললো। তার বাড়ি যাবার পথেই একজন লোককে দেখিয়ে বললো ইনি হাজী মোঃ আজিজুর রহমান। নিজেদের পরিচয় দিয়ে তার কাছে আমার উদ্দেশ্য জানালাম। শুনেই কিছুটা খেকিয়ে উঠলেন বলা যায়। বললেন, 'আমি বাপু চাষা মানুষ, চাষ করে খাই। আমার নাম লাগবি না। এখন বাজারে যাবো পড়েত (কামলা) আনতি। সময় নেই।' তাকে জানালাম এতো দূর থেকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি, যদি সময় দেন। উত্তরে বললেন, 'ঠিক আছে ঘন্টা দুই অপেক্ষা করেন, বাজারতে ঘুরে আসি।' আমাদের তখনই সময় চাই। কারণ সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ছে। ফটোগ্রাফার ছবি তুলবেন। তাছাড়া ফেরার তাগিদও আছে। বারবার অনুরোধ করায় রাজি হলেন। সেই সঙ্গে এটা মনে করিয়ে দিতে ছাড়লেন না, হাটে সময় মতো যেতে না পারাতে তার ক্ষতি হবে। ভ্যালচালক আমাদের জানালো লোকটি এমনই। তবে

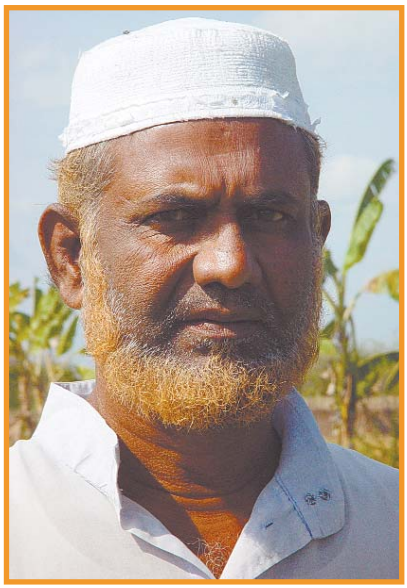

‘আজিজুর রহমান ফলের প্রজেক্টের জন্য কৃষি ব্যাংকের সাহায্য চেয়েছিলেন। কৃষি ব্যাংক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, এসব প্রজেক্টে কোনো ঋণ তারা দেবে না। আজিজুর রহমান বলেন, ‘আমাকে তারা লোন দেবে না কারণ আমি ঘুষ দেবো না। আবার তাদের পিছু পিছু ঘুরতেও পারবো না। আমি কৃষক, ফসল ফলাই, তারা আমার পেছনে ঘুরবে’

ভালো মানুষ, পরিশ্রমী এবং বন্ধুবৎসল।

হাজী আজিজুর রহমান আর ১০টা কৃষকের মতোই সাধারণ এবং গ্রামীণ। মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিয়ে করেছেন। ৬ সন্তানের জনক। তিনি ছিলেন বাবার একমাত্র সন্তান। বাবাও নিরেট চাষী ছিলেন। কিন্তু আজিজুর রহমান সেই আমলে মাধ্যমিক পাস করেছিলেন। অপসোনিনে চাকরি হবার পরও তিনি যাননি। কারণ মাটি আর মাঠ তাকে এখনকার মতোই টানতো। সময় পেলেই কিছু কিছু পড়াশোনা করেন। অন্য ১০ জন চাষীর সঙ্গে তার পার্থক্য হলো তিনি অসম্ভব স্বাপ্নিক মানুষ। তিনি চাষ নিয়ে, জমি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালাতে পছন্দ করেন। কৃষিকে বাণিজ্যিকভাবে মূল্যায়ন করেন। শুধু কৃষি কাজ করেই যে জীবনের আমূল পরিবর্তন সম্ভব এটা প্রমাণ করেছেন তিনি। বলা যায়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই তিনি সফল।

এই হলো আজিজুর রহমান। চাঁদপুর গ্রামের কৃষি ও কৃষককে তিনি অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন। ঝিনাইদহের শৈলকুপা ও কুষ্টিয়া এলাকায় তিনিই প্রথম বাণিজ্যিকভাবে কলা চাষ শুরু করেন। আস্তে আস্তে পেঁয়াজ, রসুন, ওলকপি, আলু, পেঁপে, আখ, তামাক করেছেন। এখন লিচু, সুপারি, ডালিম বা আনার, তালের বাণিজ্যিক চাষ করছেন। তিনি একটি জমিকে যে কতভাবে ব্যবহার করছেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। কৃষি বিষয়ক শিক্ষার ব্যাকগ্রাউন্ড

কলাবাগানের মাঝে পেঁপের চাষ। কলা বড় হতে হতে পেঁপে বিক্রি করে তার খরচ উঠে আসছে। পাশাপাশি কলার পোয়া বিক্রি করে তিনি উপার্জন করছেন ভালো অর্থ

না থাকলেও তিনি এটা করছেন। কিভাবে? প্রশ্নের উত্তরে হেসে বলেন, 'কেরে বাপু, চাষা বলে কি আমরা চিন্তাও করতি পারবো না? আমি সব সময় নতুন কিছু করার চেষ্টা করি। কারণ যে চাষ আমি শুরু করি, আমার দেখাদেখি অন্যরাও করে। এক সময় ওই ফসলে আর টাকা আসে না। তাই নতুন কিছু করি বা করার চেষ্টা করি। যাতে ঘরে টাকা আসে।' আজিজুর রহমান কৃষক কিন্তু চাল কিনে খান। কারণ ধান চাষে লাভ নেই। তার ভাষায়, 'ধান চাষ করে পেটের ভাত হলেও লাভ হয় না। তাই ধান চাষ করি না। মনে কইরেন না যে, ধান চাষ করতি পারি না। ওটাও পারি। আমারে সাথে কেউ পারবি না। কিন্তু লাভ নাই যে। সরকার তো ধানের দাম দেয় না।'

কৃষি নিয়ে শুধু এক্সপেরিমেন্ট নয়, সেটাতে সফল হতেও ভালোবাসেন। এই সাফল্যই তাকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। তার আশা, যতদিন বাঁচবেন নতুন কিছু করার চেষ্টা করবেন। কৃষক হলেও দেশ ও রাজনীতি বিষয়ে জ্ঞান টনটনে। তিনি এতো পরিশ্রম করছেন কেন? উত্তরে জানান, 'পরের প্রজন্ম ভালো থাকবি। আর কৃষির মাধ্যমে দেশের উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে পারতিছি। গ্রামে টাকা আসছে। দেশের টাকা বাঁচাচ্ছি। এই আর কি।' গ্রামের অন্যতম বিত্তবান ব্যক্তি তিনি। একদিনে তার এসব হয়নি। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা পেরিয়ে তিনি একজন সফল মানুষ হয়েছেন।

একাকী যুবক, নিঃসঙ্গ পথে

আজিজুর রহমানের বয়স যখন ২২/২৩, তখন তার বাবা মারা যান। বাবার একমাত্র ছেলে হওয়ায় খাওয়া-পরা নিয়ে ভাবতে হয়নি। পৈতৃক সূত্রে জমি পেয়েছেন ৩৬ বিঘা। মাঠে জমি আছে কিন্তু কোনোদিন তার খবর রাখেননি। পিতার মৃত্যু তাকে কঠিন দায়িত্ববোধের মুখোমুখি করে। কি করবেন এই ভাবনায় তার দিন যায়। এর মধ্যে দেশে উথাল-পাতাল অবস্থা। অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নেন কৃষিকাজ করবেন। কিন্তু কিভাবে? হাতে টাকা-পয়সা নেই। তাছাড়া চাষাবাদের খুঁটিনাটি ভালো জানেনও না। তারপরও তিনি কৃষি কাজ করবেন বলেই নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। প্রথম তিনি পালং শাক, কপি, গোল আলু ও টমেটো চাষ করলেন। সেই সঙ্গে মাঠে একটা টিউবওয়েল বসালেন। আনাড়ি যুবকের কাজকর্মে লোকজন তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে। আজিজুর রহমান মুখ বুজে সহ্য করেন। সময়ের অপেক্ষায় থাকেন। সে সময় সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'তখন তো শাকসবজির দাম ছিলো না। ঘরে ঘরে হতো। টমেটো কেউ কিনতে চাইতো না। তারপরও করলাম কারণ আমার আত্মবিশ্বাস দরকার ছিলো। এর পাশাপাশি এক ভগ্নিপতির সঙ্গে শেয়ারে ভুষিমালের ব্যবসা ছিলো। পাকিস্তান আমল সেটা।' প্রথম বছর মোটামুটি ফলন হলেও আত্মবিশ্বাস তৈরি হবার মতো কিছু হয়নি। পরের বছর আখচাষের সিদ্ধান্ত নিলেন। আখ

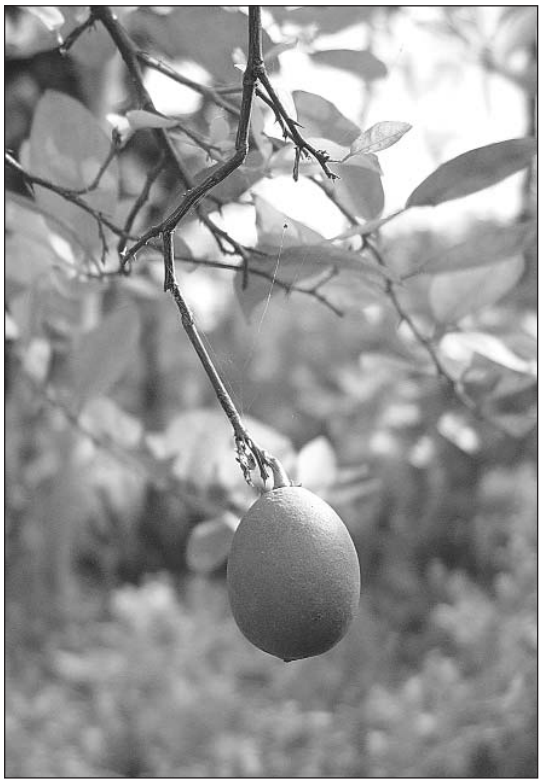

বাড়ির আঙ্গিনায় লেবুর চাষ

ক্ষেতের মাঝে তরিতরকারি। এ সময় তিনি তার মায়ের গলার হার ও ২০ ভরি ওজনের কোমরের বিছা বিক্রি করেন। সব মিলিয়ে তার হাতে নগদ ক্যাশ দাঁড়ায় ৩১০ টাকা। আখ চাষেও লস হলো তার। হাল না ছেড়ে নতুন কিছু করার কথা ভাবছিলেন। পরের বছর ৬ বিঘা জমিতে তামাক চাষ করেন। তার পরের বছর ২২ বিঘা। প্রথম বছর তামাকে বেশ ভালো লাভ হয় তার। তামাক চাষ তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো বলা যায়। তিনি বলেন, 'ওই সময় পাগলের মতো পরিশ্রম করেছি। আখ, শাকসব্জিতে লস করে মানসিক অবস্থা খুব খারাপ। তামাকে লস করলে হয়তো চাষ ছেড়ে দিতে হতো। যা হোক, তামাক দিয়ে সাফল্যের শুরু। সঙ্গে তৈরি হলো

তার দেখানো পথে সবাই তামাক চাষ শুরু করলে তিনি কলাকেন্দ্রিক চাষে মনোনিবেশ করেন। '৮৫ সালে ৪৫ বিঘা জমিতে কলা লাগান। এবারও প্রচুর লাভ হয়। লাভের টাকায় সেই আমলে ৫ লাখ ১১ হাজার টাকা দিয়ে একটা ট্রাক কিনেছিলেন

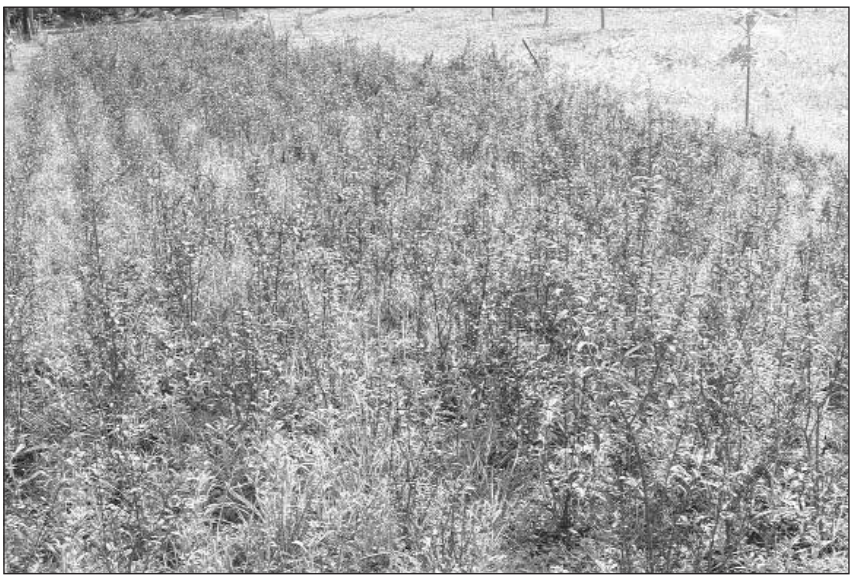

ডালিমের চারা উৎপাদন করছেন নিজেই। অর্থ উপার্জন ও নিজের কাজে ব্যবহার হবে

আরেকটি চ্যালেঞ্জ। মাঠে কাজ করি বলে লোকে চাষা বলে গালি দেয়। মুরব্বিরা পড়াশোনা করে বড় হতে বলেন। চাষার কোনো সম্মান নেই। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম অন্য কোনো কিছু নয়, শুধু চাষ করেই সম্মানিত হবো। সেই চ্যালেঞ্জ থেকে আমি আজকে সরে আসিনি।' তামাক চাষের পাশাপাশি '৭৭ সালে অল্প কিছু জমিতে তিনি কলা চাষ করেন পরীক্ষামূলকভাবে। কারণ তখনও আশপাশের কোথাও কেউ কলা চাষ করে না। তার কলা চাষের কথা শুনে লোকজন ভেবেছিল ছেলেটি পাগল হয়ে গেছে। জানা যায়, সে সময় ঝিনাইদহ জেলার অন্য একটি থানায় একজন মাত্র লোক কলার চাষ করতো। তার কাছ থেকেই কলার চারা সংগ্রহ করে এনে চাষ শুরু করেন। প্রথম বছরে তিনি ৮৫ হাজার টাকার কলা বিক্রি করেন। লাভ হয় ৬০ হাজার টাকা। '৭৮ সালে ৩২ বিঘা জমিতে কলাগাছ লাগান। ভাগ্য সহায়তা করায় এ বছর তার লাভ/লস কোনোটাই হয় না। পরের বছর ২০ বিঘা জমিতে কলা লাগান। লাভের অঙ্ক তার মনে নেই। শুধু স্মরণ করতে পারেন ধার শোধ দিয়েছিলেন ৫০ হাজার টাকা। কলা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার পাশাপাশি তামাক চাষ তো ছিলই। তামাকে তার সাফল্য দেখে ততদিনে এলাকার অনেকেই তামাকের চাষ করছেন। তামাকের ভবিষ্যৎ খারাপ ভেবে '৮২ সালে তিনি তামাক চাষ ছেড়ে দেন। শুধু কলা চাষের প্রতি মনোযোগী হন। পরিশ্রম আর অধ্যবসায় নিঃসঙ্গ এই যুবকের ভাগ্য বদলে দিতে থাকে। আজিজুর রহমান তখন অন্য মানুষ। নিঃসঙ্গ, তবে একা নয়। কারণ সাফল্যও তার সঙ্গী।

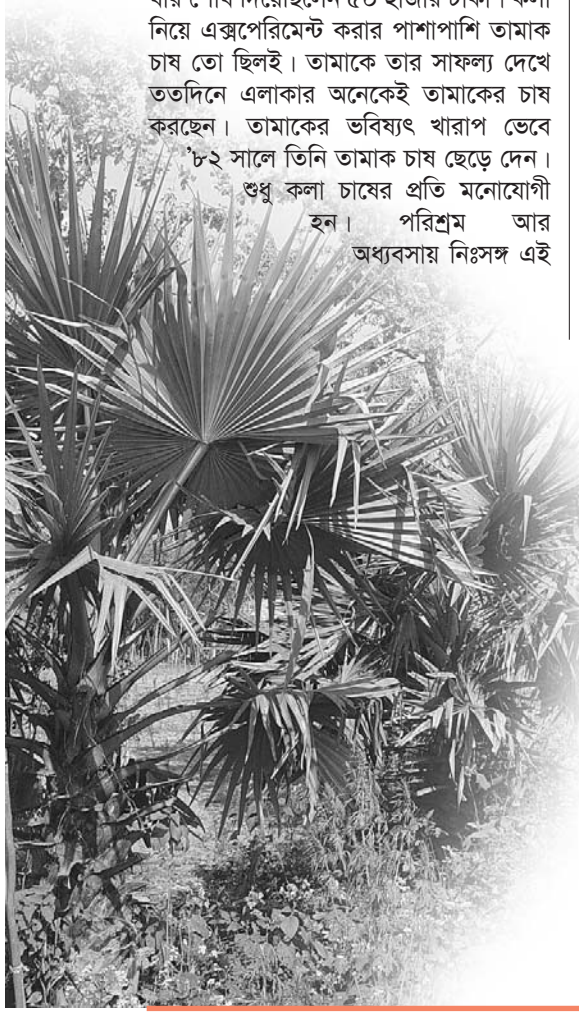

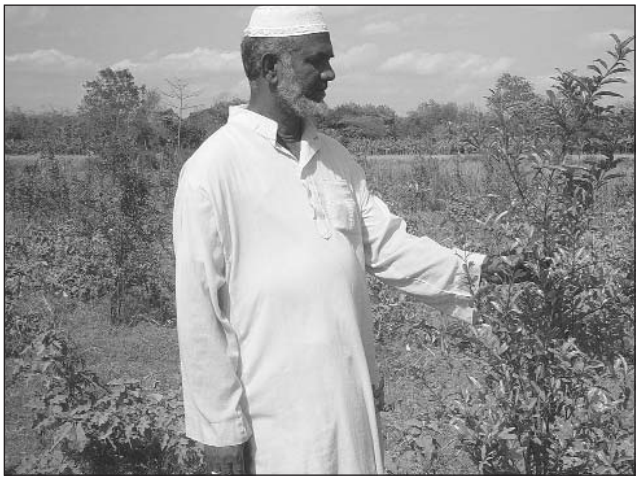

আজিজুর রহমান ডালিম ও লিচুর প্রজেক্ট দেখাচ্ছেন। এই প্রজেক্টের মাঝেই তিনি বেগুন ও তিষির চাষ করেছেন। ডালিম ও লিচুর গাছ যতোদিন পরিপূর্ণ না হচ্ছে ততোদিন এই জমির বহুমুখী ব্যবহার করবেন। এই বাগানেই একটি গরুর ফার্ম করার ইচ্ছা তার

একজন সফল কৃষক হাজার মানুষের পথিকৃৎ

চাষে যখন আজিজুর রহমানের ভাগ্য বদলাতে শুরু, তখন তার দেখাদেখি অনেকেরই। কলা আর তামাক চাষের মাধ্যমে তিনি ততদিনে স্থানীয়দের চোখে অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তার দেখানো পথে সবাই তামাক চাষ শুরু করলে তিনি কলাকেন্দ্রিক চাষে মনোনিবেশ করেন। '৮৫ সালে ৪৫ বিঘা জমিতে কলা লাগান। এবারও প্রচুর লাভ হয়। লাভের টাকায় সেই আমলে ৫ লাখ ১১ হাজার টাকা দিয়ে একটা ট্রাক কিনেছিলেন। যদিও এ জন্য তাকে সামান্য কিছু টাকা ধার করতে হয়েছিল।

যা হোক, সাফল্য আসা শুরু করেছে। আরও সফল হবার জন্য চাই আরও জমি। কিন্তু নিজেদের আছে মাত্র ৩৬ বিঘা। অগত্যা তিনি লিজে গেলেন। তার এলাকায় জমি লিজ নেবার ঘটনাও প্রথম বলা যায়। লিজ নেবার সঙ্গে সঙ্গে চাষের কৌশলে একটু পরিবর্তন আনেন। একা মানুষ তিনি। তার পক্ষে শত শত লেবার একা সামলানো প্রায় অসম্ভব ছিল। তিনি তখন শ্রমিকদের সঙ্গে চুক্তিতে গেলেন। জমি, সার যা লাগবে সব দেবেন তিনি। শ্রমিকরা মোট লাভের ৪০ শতাংশ পাবে। তার এই কৌশলে শ্রমিকরাও দারুণ সাড়া দেয়। কারণ কলা তখন অসম্ভব লাভজনক ব্যবসা। কলা চাষের সেই শুরু। এখন যে কেউ ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া এলাকায় গেলে দেখতে পাবেন মাইলের পর মাইল কলাবাগান। এ এলাকার কত মানুষ শুধু কলা চাষের ওপর তাদের জীবন বদলে ফেলেছেন সেটা নিয়ে একটা গবেষণা হতে পারে।

আজিজুর রহমানের কলার চাষ এক পর্যায়ে এমন অবস্থায় দাঁড়ালো যে তাকে একজন ম্যানেজার নিয়োগ করতে হলো সার্বক্ষণিক। '৮৫ সালের পর কলার বাজার ঊর্ধ্বমুখী। সেই সঙ্গে তার জমির পরিমাণও। এক সময় লিজসহ তিনি ১৫০ বিঘা জমিতে কলা চাষ করেন। এক পর্যায়ে তিনি ১০০ থেকে ১৫০ বিঘার মধ্যে ওঠানামা করতে থাকলেন। কলা তাকে শুধু আর্থিকভাবে দাঁড় করিয়েই দিল না, সেই সঙ্গে চাষার সম্মানও ফিরিয়ে দিল। কলার জাত ছিল সবরি। তার দেখাদেখি অন্যরাও যখন প্রচুর সবরি কলা ফলানো শুরু করে তখন তিনি সবরি চাষে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। সর্বশেষ '৯৯ সালে তিনি ১৫০ বিঘা পর্যন্ত কলা চাষ করেছেন। উৎসাহ হারানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'চাষা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ফসল ফলাই দুটো পয়সার জন্য। সবাই যখন কলা করতে লাগলো তখন দাম পড়ে গেলো। সবরি কলা তো এখন গরুর খাবার। তো কি করবো, ওই চাষ আর করবো না সিদ্ধান্ত নিলাম।'

বর্তমানে তিনি ১০ বিঘা জমিতে কলা চাষ করছেন। এগুলো সম্পূর্ণ অন্য জাতের কলা। সবরি তো নয়ই বরং সবাই যেগুলো অবহেলা করে, উনি সেগুলোকেই বাণিজ্যিকীকরণের জন্য চেষ্টা চালান।

ব্যতিক্রমী কৃষক, ব্যতিক্রমী ভাবনা

আজিজুর রহমান অন্যদের থেকে আলাদা। সবাই তাকে অনুসরণ করুক এটাই তার কাম্য। কৃষকদের অনুসারী বানাতে হলে অন্য রকম কিছু করে দেখাতে হয়। এই অন্য রকম ভাবনা সব সময় তাকে তাড়িত করে। এই তাড়নাই তাকে সফল করেছে বললে ভুল হয় না। যেমন সবরি চাষ থেকে সরে এলেও কলা থেকে তিনি সরে আসেননি। এ বছর তিনি ভিন্ন জাতের কলা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। কাঁচকলা ঢাকায় বেশ দামি হলেও গ্রামের বাড়ির কোনায় ঝোপঝাড়ে জন্মে এই কলা। এই কলা নিয়ে গ্রামের লোকেরা তেমন

একটা ভাবেও না। কাঁচকলা তিনি বাণিজ্যিকভাবে চাষ শুরু করেছেন। ৩০০ কাঁচকলার গাছ লাগিয়েছেন তিনি। কলার ফলনও হয়েছে দারুণ। অন্য আরেকটি কলা চাষ করেছেন সেটি হলো ধূপছায়া। চট্টগ্রাম এলাকায় যেটি বাংলা কলা নামে পরিচিত। এই কলাগাছ আছে ২ হাজার ২০০। ধূপছায়া কলাও গ্রামের ঝোপঝাড়, আনাচে-কানাচে হয়। দারুণ মিষ্টি আর পুষ্টিসমৃদ্ধ এই কলা সারা বছরই পাওয়া যায়। ধূপছায়া অসম্ভব সুস্বাদু। এই দুই জাতের কলার চারা (স্থানীয় ভাষায় পোয়া) সংগ্রহ জটিল কাজ। কারণ কলার জাতের সহজলভ্যতা থাকলে তা হয়তো গ্রামের সামান্য কিছু বাড়িতে দেখা যায়। আগাছা হিসেবে এই গাছগুলো জন্মে। গ্রামের লোকজন মনে করলে এই কলা খায় নতুবা পাখির খাদ্য হয়। আজিজুর রহমানের ভাষায়, এই দুই জাতের পোয়া সংগ্রহ করতে তার জীবন বেরিয়ে গেছে। দুই জাতের ফলনই ভালো হয়েছে। যে কারণে আজিজুর রহমানও খুশি। এই দুই জাতের কলা চাষে কেন উৎসাহিত হলেন? উত্তরে তিনি বলেন, 'কলা নিয়ে আমি দেশের বিভিন্ন জেলায় গেছি। বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি কাঁচকলার ভালো চাহিদা রয়েছে। আর ধূপছায়া চাষ করেছি কারণ একবার ব্যাপারীদের কাছে দুই কাঁধি ধূপছায়া পাঠিয়েছিলাম, তো সবরি বিক্রি হয়েছিল ৪০ টাকায় সেখানে ধূপছায়া ৮০ টাকা। বুঝলাম এটারও চাহিদা আছে। টাকা যেটায় আছে সেটাই তো চাষ করবো। ধূপছায়ার বাগান দেখে অনেকেই এই বাগান করতে চাচ্ছে। কিন্তু পোয়া নেই। আমি বিভিন্ন এলাকা ঘুরে পোয়া সংগ্রহ করেছিলাম। এক একটা পোয়া বিক্রি হবে ৮ টাকায়। শুধু পোয়া বিক্রি করেই আমার খরচ উঠে আসবে। কাঁচকলারও ভালো দাম পাওয়া যাবে। কথা প্রসঙ্গে জানালেন, ধূপছায়ার ভালো দাম পেলে আগামী বছর ৩০ বিঘা জমিতে চাষ করবেন।

শুধু বুদ্ধি থাকলে আর পরিশ্রম করতে জানলে সাফল্য আসবেই। তিনি বলেন, 'চাষারা সব কাজেই একশ। আমার চাইতে ভালো ধান-পেঁয়াজ কি কেউ চাষ করতে পারে? সরকার দাম দেয় না। তা'লি ওই চাষ করবো কেন? সরকার লাখ লাখ টন পেঁয়াজ আমদানি করে। কেন চাষারা কি পেঁয়াজ চাষ জানে না? সরকার উৎসাহ দেয় না। সারা বছর কষ্ট করে ফসল ফলায়, দাম না পাওয়া গেলে সেই ফসল করবো কেন? তাই যেসব ফসল মানুষ গুরুত্ব দেয় না, সে সবই আমি চাষ করে দাম পেতে চাই। লাভ হলো আসল কথা।' এই দুই জাতের বাইরেও চাঁপা সবরির ২৫০টি গাছ তিনি লাগিয়েছেন। কিন্তু এই গাছ নিয়ে তেমন কোনো প্রত্যাশা তার নেই। এই দুই

কলাবাগানের মাঝে লিচুর চাষ

জাতের কলা বিক্রি করে কত টাকা আয় হবে, সে বিষয়ে তিনি কোনো ধারণা দিলেন না। তবে ভালো অর্থ পাবেন এটা জানালেন।

চাষের বহুমাত্রিকীকরণ, আয়ের সহজ সমীকরণ

আজিজুর রহমানের বয়স হয়েছে। সন্তানেরাও যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তার এখন একমাত্র চিন্তা এমন কিছু করে যাওয়া, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর্থিক ও সামাজিকভাবে নিরাপদ থাকে। যে কারণে তিনি চাষে বহুমাত্রা আনতে চাচ্ছেন। এমন কিছু করে যেতে চান যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বসে থেকেও প্রচুর টাকা উপার্জন করতে পারে। আজিজুর রহমান এখন লিচু, ডালিম, সুপারি, গামারি কাঠ, পেঁপে চাষ করছেন। কলাবাগানের মাঝের সারি দিয়ে লিচু গাছ লাগিয়েছেন। চায়না থ্রি ও দেশী একটা জাত লাগিয়েছেন। চায়না থ্রি লিচুর পুরোটাই বিদেশে রপ্তানি হবে। অন্য জাতেরটা দেশেই বাজারজাত হবে। ডালিমের মূল্য বাংলাদেশেই আকাশছোঁয়া। লিচু-ডালিমের মাঝে লাগিয়েছেন আম্রপলি। এই বাগানে তার খরচ হয়েছে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা। এর মধ্যে লিচু বাগানের স্থায়িত্ব কমপক্ষে ১০০ বছর। ডালিম গাছ ৮ বছর স্থায়ী হবে। আম্রপলিও ২০/২৫ বছর স্থায়ী হবে। সব মিলিয়ে আজিজুর রহমানের ভবিষ্যৎ প্রজেক্টটি কয়েক কোটি টাকার ওপর দাঁড়াবে। লিচু গাছগুলো যখন ৫/৬ বছরের হবে, তখন তিনি কলা চাষ থেকেও সরে আসবেন। লিচু ও ডালিমের বাগানের মাঝে তিষি বুনেছেন। তিষি উঠে গেলে ধনিয়ার পাতা চাষ করবেন। এক-

দু'বছরের মধ্যেই ডালিম উৎপাদন শুরু হবে। আজিজুর রহমান জানান, লিচু গাছ পরিপূর্ণ হতে ১০ বছর সময় লাগবে। লিচু গাছ যখন বড় হবে তখন ডালিম গাছ কেটে ফেলবেন। যতদিন লিচু গাছ বড় না হচ্ছে ততদিন এই প্রজেক্টে বিভিন্ন রকম রবিশস্য চাষ করবেন। কিছু সবজিও করবেন। যেমন এবার ডালিম বাগানের একাংশে বেগুন চাষ করেছেন। সব মিলিয়ে এই প্রজেক্টে গাছ আছে প্রায় দেড় হাজার। পরিপূর্ণ প্রজেক্ট করতে মোট কত টাকা খরচ হবে? এ সম্পর্কে তার জবাব, 'কত টাকা খরচ হবি তার চিন্তা করে কি চাষ হয়? যা লাগে লাগবি। চাষা মানুষ এতো হিসাব-নিকাশ করলি চলে? টাকা তো জমাই না। যা আসে তা নতুন নতুন প্রজেক্টে ঢালি। শুধু জানি এক সময় অনেক অনেক টাকা আসবে। এসব চিন্তা করে লাভ নেই। ঠিকমতো চাষ করলে মাটি কাউকে ঠকায় না। আমাকেও ঠকাবে না।' কথা প্রসঙ্গে জানা গেছে, প্রতিটি ডালিম গাছ থেকে গড়ে ২৫০টি ফল আসবে। তার প্রায় এক হাজার গাছ আছে। মোটামুটি ফলন হলে শুধু ডালিম বিক্রি করেই বছরে আয় হবে ১০/১২ লাখ টাকা। তিনি জানালেন, ফল ব্যবসায়ীরা এখন থেকেই তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। ফলের বাগানের মাঝে অন্য যেসব চাষ করছেন তা দিয়েই তার খরচ উঠে আসছে। আজ থেকে ৭/৮ বছর পর প্রতিবছর তার বাৎসরিক আয় দাঁড়াবে অর্ধ কোটির ওপরে। এই হিসাব তার নিজের।

'চাষা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ফসল ফলাই দুটো পয়সার জন্য। সবাই যখন কলা করতে লাগলো তখন দাম পড়ে গেলো। সবরি কলা তো এখন গরুর খাবার। তো কি করবো, ওই চাষ আর করবো না সিদ্ধান্ত নিলাম'

তাল, সুপারি, গামারি ভবিষ্যৎ নিরাপদ করবে

আজিজুর রহমান শুধু নিজের জমিতে নয়, সরকারি জায়গায়ও গাছ লাগান। তিনি কোনো জায়গা ফাঁকা রাখতে চান না। তিনি জানেন সরকারি জায়গায় গাছের মালিকানা তার থাকবে না। এটা নিয়ে তিনি চিন্তিতও নন। তিনি বলেন, 'আমি পেলাম না, সরকার তো পাবে। সরকারি জায়গায় এখন যেসব গাছ আছে তার ফল বিক্রির টাকার ১০ শতাংশ আমি দান করে দিই। জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকলে সবার ক্ষতি। কেউ কিছু করে না, তাই সরকারি জমিতে গাছ লাগাচ্ছি।' তিনি এ পর্যন্ত কয়েকশ' তাল গাছ লাগিয়েছেন। অনেক গাছে তালও হচ্ছে। ১৭০০ সুপারি গাছের বাগান করেছেন। গামারি কাঠের একটি প্রজেক্ট আছে। এছাড়া বাড়ির অঙ্গিনা জুড়ে নানা রকমের ফলের গাছ। তাল গাছের ব্যাপারে তার ব্যাখ্যা হলো, 'তালের আঁটি যে কোনো জায়গায় ফেলে রাখলেই গাছ হয়। তালের ৫০০ রকমের ব্যবহার আছে। তালের মিছরিতে কাশি সারে। তালের গুড়, পিঠা, রস সবই ভালো দামে বিক্রি হয়। হাতপাখা তৈরির জন্য এক একটি তালের ডগা বিক্রি হয় প্রায় ৪ টাকা। তালের কাঠও দারুণ কার্যকর। সুতারাং এতো উপকারী একটি গাছ না লাগানোই তো অন্যায়।' শত শত তালগাছ থেকে তার কত টাকা আয় হয় সে হিসাব তার কাছে নেই। ২০ বছর পরে গামারি গাছ বিক্রি করে বেশ কয়েক লাখ টাকা হবে। আর সুপারি তো সারা বছরই ফল দেয়। সুপারির দামও ভালো। এক হিসাবে দেখা যায়, কৃষি উপকরণ থেকে সারা বছরই টাকা পেতে থাকেন। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে একটা বরইয়ের বাগান করা। একটা গরুর খামার করা। লিচু বাগানের মধ্যে তিনি গরুর খামার করবেন। কারণ লিচুর পাতা গরু খায় না। হাতে কিছু টাকা-পয়সা জমলেই এগুলো শুরু করবেন।

চাষ বদলে দিয়েছে ভাগ্য

এক সময় আজিজুর রহমানের বাড়িতে খড়ের ঘর ছিলো। এখন বিশাল বাড়ি তার। সবগুলোই পাকা ঘর। একটি ট্রাক, একটি বাসের মালিক। পৈতৃক জমির সঙ্গে নতুন কিছু জমিও করেছেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনিও পেরিয়ে এসেছেন। সন্তানরাও প্রতিষ্ঠিত। তার দেখাদেখি গ্রামের অন্য অনেকেই প্রতিষ্ঠিত। আগে আজিজুর রহমান দেশের বিভিন্ন জায়গায় উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে নিয়ে যেতেন। এখন ব্যাপারীরা তার বাড়িতে এসে নিয়ে যায়। খুব প্রয়োজন হলে নিজের ট্রাকে করেই পাঠিয়ে দেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। কৃষি কাজ আজ তাকে সম্মান দিয়েছে। সমাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। চ্যালেঞ্জে জয়ী তিনি। তারপরও তিনি মনে করেন অনেক সামনে যাওয়ার আছে তার। বয়সকে বড় প্রতিবন্ধকতা মানছেন। তার ভাষায়, 'চাষা ভালো খেতে-পরতে পারে না। ভদ্র সমাজে

মিশতে পারে না। সেই দুর্নাম ঘোচাতে পেরেছি। সরকার আমাদের সহযোগিতা করলে শুধু চাষ দিয়েই বাংলাদেশ বদলে যেতে পারতো। বিদেশে সরকার ভর্তুকি দেয়। আর আমাদের সরকার কৃষিঋণ দেয়, তাও আবার সুদে। চাষার আবার সুদ কিসে! আগে টাকা দিয়ে চাষাকে দাঁড় করাতি না পারলে সুদ দেবে কেমনে? চাষে ভাগ্য বদলে ফেলা সম্ভব। সকলের সহযোগিতা দরকার। আমি চাষ নিয়ে পরীক্ষা চালাই, কারণ একটাতে লস হলি যাতে অন্যটায় যাতি পারি। বয়স হয়ে গেছে বলে অনেক কিছু করতে পারি না। তা না হলি দেখায়ে দিতাম।' শুধু বছরে তার এক হাজারেরও বেশি শ্রমিক প্রয়োজন হয় বলে তিনি জানিয়েছেন।

সরকারের সাহায্য নেই, তবুও কৃষক

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। কৃষক বাংলাদেশের। কিন্তু কৃষকের জন্য সরকারের তেমন কোনো বরাদ্দ নেই, কোনো উদ্যোগ নেই। তবুও কৃষক ফসল ফলায়। বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার ফল বাংলাদেশে আসে। আজিজুর রহমান ফলের বাগান করেছেন এই একটি বিষয়ের বিপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য। তার দেখাদেখি অন্যরাও যদি জমির বহুমুখী ব্যবহার করে, ফল উৎপাদন করে, তবে কিছুটা হলেও ফলের আমদানি ঠেকানো সম্ভব। তার কথা, কৃষক টাকা পাবে। গ্রামে টাকা আসবে। চাষা মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াবে।

আজিজুর রহমান ফলের প্রজেক্টের জন্য কৃষি ব্যাংকের সাহায্য চেয়েছিলেন। কৃষি ব্যাংক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, এসব প্রজেক্টে কোনো ঋণ তারা দেবে না। আজিজুর রহমান বলেন, 'আমাকে তারা লোন দেবে না কারণ আমি ঘুষ দেবো না। আবার তাদের পিছু পিছু ঘুরতেও পারবো না। আমি কৃষক, ফসল ফলাই, তারা আমার পেছনে ঘুরবে।'

এ এলাকার চাষীদের পথিকৃৎ তিনি। এখন পর্যন্ত কোনো সরকারি স্বীকৃতি তার কপালে জোটেনি। যদিও থানার কৃষি কর্মকর্তারা তার নিত্য-নতুন কৃষির ধারণা সম্পর্কে সচেতন। সরকারি স্বীকৃতিটুকু তিনি আশা করেন। তিনি বলেন, 'আমি নামের ধার ধারি না। টাকা চাই। টাকার জন্য সারা বছর পরিশ্রম করি। টাকার পাশে দেশের উন্নতিতে আমি সাধ্যমতো অবদান রাখতে চাই। সে জন্যই এতো কষ্ট করা। সরকারি পদক পাইনি। পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি জানি, এমন এক দিন আসবে যেদিন সরকার পদক আমার বাড়িতে বয়ে আনবে।' কৃষি অফিসের একজন সুপারভাইজার নিয়মিত তার খোঁজ-খবর রাখলেও ঐ অর্থে কোনো সমর্থন মেলে না। কারও মুখাপেক্ষী নন তিনি। তার কথা, 'বাঁচতে হলে একাই বাঁচতে হবে। সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে তো আর পেট ভরবে না। তাই নিজের চেষ্টা নিজেই করি। কৃষি ব্যাংক আজ লোন দিচ্ছে না। একদিন টাকা নিয়ে বসে থাকবে। আরে বাবা, সব হলো রাষ্ট্রের ভেল্কিবাজি। সরকারগুলো লম্পট, মিথ্যাবাদী। চাষাদের তারা নির্বোধ ভাবে। অথচ চাষার ওপর পশু-পাখিসহ সবাই নির্ভরশীল। চাষাকে নির্বোধ ভাবার কি মানে আছে! চাষার পা-ফাটা, লোন যদি খায়ে ফেলে এই জন্যে তারা লোন দেয় না।'

সরকারের সাহায্য ছাড়াই কোটি কোটি কৃষক জীবন যুদ্ধে লিপ্ত। সরকার সহযোগিতা করলে আমাদের কৃষি বাংলাদেশকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারতো। সরকার সাহায্য না করলেও গ্রামবাসী তাকে সাহায্য করেন। তিনিও গ্রামবাসীকে। পারস্পরিক সৌহার্দ্য আজিজুর রহমানকে দিয়েছে সফলতার চাবিকাঠি।

মরে যাবো, রেখে যাবো স্মৃতি

মৃত্যুর পরও সবাই তাকে মনে রাখুক এটাই তার ইচ্ছা। কৃষি কাজের মধ্য দিয়েই তিনি অমর হতে চান। কৃষি বিষয়ক অল্প-বিস্তর পড়তে ভালোবাসেন। জৈব সারের প্রতি তার অসীম আগ্রহ। রাসায়নিক সারের পাশে তার বিশাল সাম্রাজ্যে জৈব সারের ব্যবহার অনেক। তিনি হিসাব করে দেখান, একটি পরিপূর্ণ গরু পুষলে তার গোবর, বাড়ির তরকারির উচ্ছিষ্ট, গাছের পাতা সব মিলেয়ে বছরে ৮০০ মণ কমপেস্ট সার পাওয়া সম্ভব। নিজের বাড়ির সার ছাড়াও তিনি অন্য কৃষকদের কাছ থেকে জৈব সার কিনে ব্যবহার করেন। অন্যদিকে তিনি পরিকল্পনা করে রেখেছেন, কয়েক বছরের মধ্যে তার সাম্রাজ্য একটা ফার্মে পরিণত হবে। দর্শনীর বিনিময়ে কৃষির এই ফার্ম লোকজন দেখতে আসবে। তার সব প্রস্তুতিও তিনি সম্পন্ন করেছেন বলে জানালেন। বয়স আর টাকা থাকলে আরও অনেক কিছু করার পরিকল্পনা ছিলো। পুরো প্রজেক্টকে পাইলট প্রজেক্টে রূপান্তরিত করতে পারলে দেশের অনন্য কৃষকরা উপকৃত হতেন। জমির বহুমাত্রিক ব্যবহার একজন নিরক্ষর কৃষককে উন্নতির চূড়ান্তে নিয়ে যেতে পারে- এটাই তার মেসেজ। আজিজুর রহমান তার জমিতে এতো কিছু করেছেন যে তা একটি রিপোর্টের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে তুলে আনা অসম্ভব প্রায়।

কৃষি জমিতে লিচু, ডালিম, আম, গামারি, সুপারি, লেবুসহ অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন করে তিনি ইতিমধ্যেই অন্যদের পথিকৃৎ। কত টাকা তিনি আয় করেন সে হিসাব তিনি জানেন না বলে জানান। কিন্তু টাকার অঙ্কটা বিশাল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে আজিজুর রহমানের মতো অনেক মানুষের প্রয়োজন। যারা বদলে দেবে দেশ আর অর্থনীতি।

ছবি : আনোয়ার মজুমদার